উত্তাল অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান

মাহবুব আলম

ছাত্র আন্দোলন বারবার বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ। ক্ষমতাসীন শাসকরা কিছুই করতে পারেনি। মাথা ঝোঁকাতে হয়েছে তাদের। ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১, ৯১ এবং ২০১৮ তার প্রমাণ। ৫২'র ছাত্র আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন হত্যা নির্যাতন করে দমাতে পারেনি। ওই আন্দোলনের জয়ের ধারায় মাত্র দুই বছরের মাথায় ৫৪ সালে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় পাকিস্তান আন্দোলনের বিপুল জনপ্রিয় দল মুসলিম লীগ।

৬২'র ছাত্র আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকে। গ্রেফতার দমন পীড়ন নির্যাতন করে সরকার আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়।

৬৯'র ছাত্র আন্দোলনও হত্যা নির্যাতন করে বন্ধ করা যায়নি। ওই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। বিদায় নেয় পাকিস্তানের লৌহমানব খ্যাত আইয়ুব খান। ৭১-এর ছাত্র গণআন্দোলনে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

৯১'র ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ স্বৈরশাসনের পতন হয়। ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য হয় সরকার। বাধ্য হয় নির্বাহী আদেশে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংরক্ষিত ৩০ শতাংশ কোটাসহ সকল কোটা বাতিল করতে।

সর্বশেষ ২০২৪-এ ছাত্রদের কোটাবিরোধী, কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরকারের ভিত নড়ে উঠে। কেঁপে উঠে সমগ্র দেশ ও জাতি। তাইতো শাসকদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। হৃদকম্পন শুরু হয়। সেই সাথে ভিত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে শাসকদের সহযোগী দল, গোষ্ঠী ও তাদের সুবিধাভোগী লুটেরার দল। ভয়ে তারা দিশেহারা হয়ে একের পর এক ভুল করে নিজেরাই আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢালে। মন্ত্রীদের অতিকথনে আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মাসব্যাপী এই আন্দোলনে ইতিমধ্যে ঝরে গেছে ৩ শতাধিক তরতাজা প্রাণ। র‌্যাব পুলিশ ছাত্রলীগ যুবলীগের লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস সাউন্ড গ্রেনেডের হামলা থেকে রক্ষা পায়নি মায়ের কোলের ছোট্ট শিশুও। সেই সাথে নারী পুরুষ সহ স্কুলগামী শিক্ষার্থীও। এমনকি ঘরের ভিতর বাড়ির ছাদে নিরাপদ স্থানে থেকেও অনেক শিশু কিশোর গৃহবধূ ছাত্র জনতা নির্মম মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এ যেন মৃত্যুর মহোৎসব। রক্তের হোলি খেলা। বাংলাদেশ কেন আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এই হত্যাযজ্ঞ একেবারে নজির বিহীন।

নিহত সংখ্যা শেষ পর্যন্ত কত হবে তা জানার জন্য আমাদের অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে বেশ কিছু লাশ বেওয়ারিশ হিসাবে বিভিন্ন কবরস্থানে দাফন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বন্ধু দেশ ভারতের মিডিয়ায় বলা হয়েছে ২০ থেকে ২৩ জুলাই সময়ে ঢাকার রায়েরবাজার কবরস্থানে ৩৬টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। এরপর এই কবরস্থানে আরো

২৯টি বেওয়ারিশ লাশ দাফনের রিপোর্ট করেছে ভারতের জনপ্রিয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া। একই সঙ্গে খবরে বলা হয়েছে, আন্দোলন চলাকালে নগরীর অন্যান্য কবরস্থানেও কিছু বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। এছাড়া অনেক বাবা মা তাদের আদরের ধন প্রিয় সন্তানের লাশের কাটা ছেঁড়া এড়াতে নিরবে নিজ এলাকায় দাফন সম্পন্ন করেছে। ফলে নিহতের পুরো পরিসংখ্যন পেতে একটু সময় লাগবে। তবে ইতিমধ্যে জানা গেছে, ১৯ শে জুলাই থেকে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত ৩২টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই নিহতদের অনেকেই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। মারা গেছে বুক পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে। এক পুলিশ কর্মকর্তা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নিজ পুত্রের বুক দেখে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ফোন করে জানতে চান একজন ছাত্রকে হত্যার জন্য কটা গুলি লাগে। কি নির্মম ঘটনা, এই ঘটনা ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে।

রংপুরে সাঈদকে খুব কাছ থেকে একের পর এক গুলি করে তার বুক ঝাঁঝরা করে মৃত্যু নিশ্চিত করে এক পুলিশ কনস্টেবল। শুধু তাই নয়, হেলিকপ্টার থেকেও টিয়ার সেল নিক্ষেপ ও গুলি করা হয়। নারায়ণগঞ্জে বাড়ির ছাদে বাবার কোলে তিন বছরের শিশু কন্যা রিমা মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁজ থেকে বাঁচতে জানালা লাগাতে গিয়ে মাথায় গুলি খেয়ে নিহত হয়েছে আরেক কিশোর। একইভাবে বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে এক গৃহবধূ। এমন অসংখ্য ঘটনার কত বর্ণনা দেব? এ কোন বাংলাদেশ? এই প্রশ্ন এখন সর্বত্র। তারপর এটাই নির্মম সত্য যে, এটাই এখন বাংলাদেশ। এই মর্মস্পর্শী ও মর্মান্তিক ঘটনায় দেশের মানুষ একেবারে স্তম্ভিত হতভম্ব। ফেসবুক ও ইউটিউবে এই দৃশ্য দেখে অনেক মানুষ একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। এত মৃত্যু এত প্রাণহানিতে তাই হবার কথা। হয়েছেও। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির দেশবাসীর এত মৃত্যু এত রক্ত এত প্রাণহানির জন্য দুঃখ অনুশোচনার পরিবর্তে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে সম্পদ ধ্বংসের বেদনায়। আমাদের গণমাধ্যমে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পদহানির দৃশ্য তুলে ধরে গভীর দুঃখ বেদনার সঙ্গে। সেই সঙ্গে আক্ষেপের শেষ নেই গণমাধ্যম ও এক শ্রেণির মানুষের।

তাইতো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রাণের মূল্য বেশি না সম্পদের মূল্য বেশি? সম্পদ ধ্বংস হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা তো মেরামত করা যাবে, নতুন করে করা যাবে অতীতে বিভিন্ন সময় বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমনটা বহুবার হয়েছে। আবার তা বারবার গড়ে তোলাও হয়েছে। কিন্তু যেসব প্রাণ ঝরে গেছে সেই সব প্রাণ কি ফিরে পাওয়া যাবে? যে মায়ের বুক খালি হয়েছে সেই মায়ের বুকে কি সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। এ কোন বাংলাদেশ? এই বাংলাদেশ কি চেয়েছিল ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য বুদ্ধিজীবী নামধারী এমনকি সাংবাদিকতার নামে বছরের পর বছর অপসাংবাদিকতায় লিপ্ত সরকারের সুবিধাভোগী এক শ্রেণির সাংবাদিকরা হত্যা নির্যাতন ও হাসপাতালের বেডে হাত পা চোখ হারানোদের আর্তনাদের চিত্র না তুলে কোথায় কোন স্থাপনা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার অনুসন্ধানে জীবনপণ করে নেমে পড়ে। এবং সেখানেও সত্যাশ্রয়ী অনুসন্ধানের নামে তোতাপাখির বুলি আওড়ায়। আর নেতা-নেত্রী-মন্ত্রীরা তো সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে একেবারে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয় গত ১৪ বছরে যেসব লুটেরা ১১ লাখ কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে তারাও চোখে গ্লিসারিন দিয়ে টিভির পর্দায় মায়াকান্নায় ভেঙে পড়ে। এটাই হয়। এটাই হবার কথা। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে কার্ল মার্কস বলে গেছেন, গণহত্যার পর লাশের সাগরের দিকে বুর্জোয়া শ্রেণি এক পলকও তাকাবে না অথচ কিছু ভাঙা ইট কাঠ আর সিমেন্ট দেখে তাদের কান্নার রোল পড়ে যাবে। কি নির্মম সত্য কথা। তার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে। যা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল করেছে টিভির পর্দায়।

এখন প্রশ্ন হলো – এই সম্পদ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করলো কারা? ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে এর কি কোনো সম্পর্ক আছে? ছাত্র আন্দোলন তো শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলন। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইচ্ছা করলেই কি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সশস্ত্র সহিংস আন্দোলনের তকমা দেওয়া যায়? না, যায় না। আর দিলেও তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। ঠিক তেমনি কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সহিংস আন্দোলনের তকমা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কেউ এটা বিশ্বাস করেনি। করার কথাও না। কারণ ফেসবুক ও ইউটিউব প্রচারই বড় প্রমাণ। শুধু তাই নয়, সাধারণ গণআন্দোলনে প্রতিপক্ষকে রুখে দিতে অনেক সময় বাঁশের লাঠি নিয়ে মাঠে

নামার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এবারে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অল্প বয়সের তরুণ বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কেউই লাঠি হাতে বিক্ষোভে আসেনি। বিক্ষোভে নামেনি। বরং যা দেখা গেছে তা হলো নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর ছাত্রলীগের যে হামলা হয় সেই হামলাকারীরাই লাঠিসোটাসহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। তাদের অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেছে। এবং তারা এই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ছাত্রদের প্রতি গুলিও ছুড়েছে। সংবাদপত্রে ও টিভির পর্দায় সেই দৃশ্য পুরো দেশবাসী দেখেছে।

শুধু তাই নয়, ছাত্ররা যখন এই ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া করছে তখন ওরা পুলিশের ছত্রছায়ায় পুনরায় সংগঠিত হয়ে বারবার ছাত্র মিছিলে হামলা করেছে। চেষ্টা করেছে ছাত্র আন্দোলনকে সহিংস করে তুলতে। কিন্তু না, ছাত্ররা কোনো উস্কানিতে পা দেয়নি। আর দেবেই বা কি করে? তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় পাবে লাঠিসোটা। আর বোমা গুলি? ওটাতো ছাত্রলীগের বিষয়, যুবলীগের বিষয়, স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিষয়। এর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কখনো পরিচয় ছিল না। এখনো নেই। তারপরও সরকারি স্থাপনায় হামলা ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্র আন্দোলনকে দায়ী করে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথে নেওয়ার অব্যাহত চেষ্টা করা হয়। অবশ্য, শেষ সময়ে সরকারের নেতা - মন্ত্রীরা বলেছে, আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে পড়েছে। প্রশ্ন হলো তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কি করলো? ওদের দায়িত্ব কি? নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের উপর লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরত্ব প্রদর্শনই কি পুলিশের একমাত্র কাজ? যাইহোক কিছু সরকারি স্থাপনা হামলা ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার জন্য ছাত্রদের দায়ী না করে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত দরকার। তদন্ত হলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

এদিকে ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ায় শিক্ষক অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষ। পাশে এসে দাঁড়ায় শিল্পী কবি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিককর্মীসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। সিপিবি, বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন ছাত্রদের দাবির পক্ষে রাজপথে নেমে পুলিশের লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস গ্রেপ্তার নির্যাতন অপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসব বিক্ষোভ সমাবেশে শতাধিক নেতাকর্মী গ্রেপ্তার ও অনেকেই আহত হয়। ৩০ জুলাই পল্টনে ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সিপিবির মশাল মিছিলে পুলিশের লাঠি চার্জ হয়। এরপর ওই মিছিল থেকে শ্রমিক নেত্রী জলি তালুকদার সহ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। একই দিন বরিশালে বাসদের নেত্রী মনিষা চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন মিছিলে লাঠি চার্জ করে বেশ কয়েকজন নেতা কর্মীকে আহত ও গ্রেফতার করে। ঐদিন উদীচীর নেতৃত্বে রাজধানীর গানে গানে প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক কর্মী অংশগ্রহণ করে। তবে ওদের গানের মিছিল পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে সমাবেশ করতে চাইলেও তা তারা করতে পারেনি। কারণ পুলিশ তাদের জিরো পয়েন্টে বাধা দেয়।

দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি ছাত্র আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিলেও ৩০ জুলাই পর্যন্ত মাঠে নেমে আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে কোন কর্মসূচি পালন করেনি। তবে তারা গ্রেপ্তার নির্যাতনের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছে মাত্র।

বিএনপি রাজপথে নেমে ছাত্র আন্দোলনের পাশে থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কিছু আসে যায়নি। কারণ মানুষ মাঠে নেমেছিল। শুধু দেশ নয় বিদেশে প্রবাসীরাও মাঠে নেমে ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বিক্ষোভ মানববন্ধন করে। এমনকি আরব দেশগুলোতে যেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ নিষিদ্ধ সেখানেও প্রবাসী বাঙালিরা ছাত্রদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এমনি এক বিক্ষোভের অপরাধে আমিরাত কর্তৃপক্ষ তিনজনের যাবজ্জীবন জেল ও চুয়ান্ন জনকে ১০-১১ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে। একেই বলে দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা। ছাত্রদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। দ্বীপ দেশ মালদ্বীপেও ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শতাধিক প্রবাসী শ্রমিক গ্রেফতার হয়েছে। এই গ্রেফতারকৃত শ্রমিক এজন্য আফসোস না করে ছাত্র আন্দোলনের বিজয় কামনা করেছে। তাইতো কোটা সংস্কার আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে পরিণত হয়। যার সর্বশেষ পরিণতি ছাত্র জনতার এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান। আর এই গণঅভ্যুত্থানে গণআন্দোলনের এক সময়ের জনপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার পতন। যা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই ঘটেছে। এটাই হয়েছে বাংলাদেশে। শুধু তাই নয় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাও তড়িঘড়ি করে। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে তিনি পদত্যাগের ঘোষণাটা পর্যন্ত দিতে পারেননি। কারণ তাকে দ্রুত ছুটতে হয়েছে হেলিকপ্টার ধরতে।

কারফিউ দিয়ে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ ও বিজিবি-সেনাবাহিনী নামিয়েও সরকার পরিস্থিতির সামাল দিতে পারেনি। ১৯ জুলাই সারাদেশে কারফিউ জারি করে বিজিবি ও সেনাবাহিনী নামানো হয়। দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকারি অফিস আদালত কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট যোগাযোগসহ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এর মতো সকল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এতে শুধু দেশের মানুষ নয় পুরো দেশ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশের স্বজনদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রবাসীদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ওরা ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারপরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। স্বাভাবিক করতে পারেনি সরকার। পরে কারফিউ শিথিল করে সীমিত সময়ের জন্য অফিস আদালত চালু করা হলেও পরিস্থিতি যথা পূর্ব তথা পরং। কারণ দমন নিপীড়ন নির্যাতন এমনকি কারফিউয়ের মধ্যে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় পুলিশ বিজিবি এমনকি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েও।

'যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবেই তুমি বাংলাদেশ' এই মন্ত্রে উজ্জীবিত দেশের ছাত্র জনতা রুখে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায় শিক্ষক অভিভাবক শিল্পী সাহিত্যিক সহ সকল সাংস্কৃতিক নেতাকর্মী। সেই সাথে ক্ষুদে দোকানদার ও পাড়া মহল্লার তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু প্রশ্ন হলো সুপ্রিম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের রায়ে ছাত্রদের কোটা সংস্কারের বিজয়ের পরও কেন আন্দোলন সংগ্রাম? কোটা আন্দোলনের বিজয়ের পর এদের ইস্যুটা কি? ইস্যু কোটা, একটাই প্রধান ও সর্বপ্রথম। কিন্তু শুধুই কোটা নয় ইস্যু হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডের বিচার। আজ হোক কাল হোক হত্যাকাণ্ডের বিচার হবেই। ইস্যু কি?

সেটা শুধু কোটা আর হত্যাকাণ্ড নয়। মৌলিক ইস্যু রাষ্ট্র কিভাবে চলছে? কিভাবে চলবে?

একটি অনির্বাচিত দায় দায়িত্বহীন সরকার থাকলে দেশে কি হয় তার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ কোটা সংস্কার আন্দোলনে পাখির মতো গুলি করে হত্যা, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গ্রেপ্তার, দমন নিপীড়ন নির্যাতন। কারণ শেখ হাসিনা সরকারের কোন জবাবদিহিতা ছিল না। এ বিষয়ে সিপিবির উপদেষ্টা কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। জনগণের ভোটের কোন তোয়াক্কাও নেই। তারই ভয়াবহ পরিণাম কোটা সংস্কার আন্দোলনে দমন পীড়ন, নির্যাতন ও যতেচ্ছা হত্যাকাণ্ড। তিনি বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রদের যে অংশগ্রহণ দেখেছি তা অতীতে কখনো কোনদিন দেখিনি। আসলে ছাত্রদের মনের ভিতর থেকে একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মনটাকে বুঝতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ যে ন্যারেটিভ দিচ্ছে তা আজকের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বুঝতে হবে চাকরির নিশ্চয়তা নেই। যে কটা চাকরি আছে তাও আবার কোটা দ্বারা সংরক্ষিত। সুতরাং ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হতেই পারে। তিনি আরো বলেন, কোটা থাকতে পারে কিন্তু তা মেধার গুরুত্বকে অতিক্রম করে নয়। এটা কোনভাবেই মঙ্গলজনক হতে পারে না। অবহেলিতদের ক্ষেত্রে কোটা থাকতে পারে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিদের এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না।

তিনি আরো বলেন মুক্তিযোদ্ধারা দেশ চালাবে, এটা যুক্তিসঙ্গত ছিল মুক্তিযুদ্ধের পর। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছিলেন দেশ চালাবে মুক্তিযোদ্ধারা। আমরা সহ সেই সময়ের সব দল বলেছিলাম একটা বিপ্লবী সরকার গঠন করা হোক। দেশ সেই পথে অগ্রসর হয়নি। সেটা হলে ভালো হতো। দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু সেটা হয়নি। এখন পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। এখন আর আওয়ামী লীগের ন্যারিটিভের বাস্তবতা নেই।

সেই বাস্তবতা থাকলে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে 'আমাদের ছাত্রলীগই যথেষ্ট' এই দম্ভোক্তি কোন নেতা মন্ত্রী করতে পারত না। এই দম্ভোক্তি ছাত্রলীগকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে। যে ছাত্রলীগ এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা যে ছাত্রলীগ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সেই ছাত্রলীগের কি অবস্থা হলো সাধারণ ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে তা তো দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এটা কোনমতেই শুভ সংকেত নয়।

এই ছাত্র আন্দোলন শুধু দেশ নয় বিদেশেও বিপুলভাবে প্রশংসিত ও সমর্থিত হয়েছে। কারণ তাদের অসীম ধৈর্য মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য। শত উস্কানিতেও তারা সংহিসতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। লাঠি গুলির বিরুদ্ধে তারা স্লোগানে স্লোগানে গানে গানে প্রতিবাদ করেছে। লাঠি গুলির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায় রুখে দাঁড়িয়েছে। এ এক অসাধারণ অভূতপূর্ব ঘটনা। শুধু ছাত্ররা নয় শিক্ষকরাও মাঠে নেমেছে। এমনকি স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারাও। ওরাও মাথায় লাল সবুজ পতাকা বেঁধে অধিকারের দাবি জানিয়েছে। ওদের রাজাকার বলা হলে তা তারা রুখে দিয়েছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রমাণ করে দিয়েছে, পক্ষে না থাকলে কথায় কথায় জামাত-শিবির রাজাকার এই ন্যারোটিভ এখন অকার্যকর। আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের ন্যারেটিভ পুরোপুরি ফেল। তার বড় প্রমাণ সারাদেশে ছাত্রদের একটি স্লোগান- পা চাটলে সঙ্গী, না চাটলে জঙ্গি। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে শেষ মুহূর্তে জামাত-শিবির নিষিদ্ধ করে। এটা মন্দের ভালো। মন্দের ভালো এই জন্যই যে, এটা অনেক বিলম্বিত সিদ্ধান্ত। অবশ্য একটা কথা আছে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। সেদিক দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার শেষ বেলায়, বিদায় বেলায় নিঃসন্দেহে একটা ভালো কাজ করেছে। এতে সবচেয়ে ভালো হলো এখন আর যারে তারে স্বাধীনতাবিরোধী তকমা দিয়ে রাজাকার বলতে পারবে না। কাজেই ভবিষ্যতের জন্য আওয়ামী লীগকে নতুন ন্যারেটিভ ঠিক করতে হবে।

হঠাৎ করে কেন এই আন্দোলন? আর কেনই বা তার তীব্রতা এত বেশি? কারণ সুস্পষ্ট। তা হলো বেকারত্ব। চরম বেকারত্ব। একটা চাকরির জন্য লাগে মোটা অঙ্কের ঘুষ। এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিনের। এখন ইচ্ছা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। শুধু সরকারি চাকরি নয়, বেসরকারি চাকরি পেতেও ঘুষ দিতে হয়। কারণ এখন চাকরি কেনাবেচা হয়। যে যত বেশি টাকা দিতে পারবে তার তত আগে চাকরি হবে। এখানে মেধা যোগ্যতার প্রশ্ন গৌণ। আর এই ঘুষ দিতে চাকরি কিনতে চাকরিপ্রার্থীদের বাবা-মা তাদের জায়গা জমি ঘরবাড়ি এমন কি ঘটিবাটি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এজন্য কারণ সব ক্ষেত্রে ঘুষ দিলেও চাকরি হয় না। এতে করে মানুষ নিঃস্ব থেকে আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চালচিত্রই এর বড় প্রমাণ। স্বাধীনতার পর ধনী দারিদ্র্যের বৈষম্য বেড়েছে বহুগুণ। এই বৃদ্ধি মোটেও সহনীয় মাত্রায় নয়। অত্যন্ত অসহনীয় মাত্রায়। এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।

পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবারের স্থলে স্বাধীন বাংলাদেশে ২২ হাজার পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল সাম্য মানবতা। অর্থনীতির গতিমুখ হবে সমাজতন্ত্রের অভিমুখী কিন্তু তা হয়নি। চেতনার কথা বলা হলেও মুক্তিযুদ্ধের এক দশকেও কম সময়ে সাম্য-সমাজতন্ত্রের নীতি নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি। ফলে আমাদের যুবকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে। এতে অনেকে সফল হলেও অনেকেই লাশ হয়ে দেশে ফিরেছে। আর মা-বাবা সন্তান হারার সাথে সাথে গৃহহারা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। তাই সামান্য চাকরির জন্য এই জানবাজি লড়াই।

এ বিষয়ে 'প্রথম কলকাতা'র একটি রিপোর্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। রিপোর্টের মূল অংশ নিম্নরূপ:

এবার ৯৩% মেধার ভিত্তিতে চাকরি, এ জয় আসলে প্রাপ্য জয়। মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, দেশের রাষ্ট্র পরিকল্পনাকে সেই মতোই হতে হবে, মেধা তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান পাবে। প্রশ্ন থাকে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে শিক্ষিত তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু নিশ্চয়তা দেওয়া গেছে? কেন তরুণ সমাজকে সামান্য একটা চাকরি নিশ্চিত করতে আন্দোলন করতে হবে? প্রাণ দিতে হবে? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক দলকে মুক্তিযোদ্ধার কোটা বেশি রেখে কেন প্রমাণ দিতে হবে? গোড়ায় গলদ থেকে যায়নি তো, এই প্রশ্ন তুলেছে বুদ্ধিজীবী মহল। আজ প্রাপ্য জয়। এরপর, মুক্তিযোদ্ধা কোটা বিরোধী এই আন্দোলন আসলে কি অন্য কোন আন্দোলনের সত্যিই ইঙ্গিত ছিল? ছাত্র আন্দোলনের চোখ একটা ছাত্র আন্দোলনই ছিল এবং এই ছাত্র আন্দোলনের ন্যায্যতা অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এ কথা সত্য সত্য দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের মতো বড় দুটি ইস্যু বাংলাদেশের মানুষকে ভাবাচ্ছে বহুদিন ধরে, তার সাথে ভাবাচ্ছে নির্বাচন নিয়ে সব দলের অংশগ্রহণ না হওয়া ও ভোটাধিকার নিয়ে ক্ষুব্ধরা ছাত্রদের সাথে বিশেষ করে যখন সাধারণ মানুষ মিশে গেলেন তখন এই আন্দোলনটাই, তখন গণআন্দোলনের রূপ রাখছে। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বাইরে সামাজিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করলে সরকার পক্ষে মাথা ঘামায় না, বৃহত্তর পরিসরে সরকারের উপর চাপ আসলে তখনই নড়েচড়ে বসতে হয় সরকার পক্ষকে, কারণ ক্ষমতা হারার ভয় সবাইকে তাড়া করে বেড়ায়, তখন কোটাবিরোধী আন্দোলন নিরাপদ সড়কের মতো আন্দোলনগুলো অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সেগুলোর ক্ষমতা থাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মতোই।

এই আন্দোলনের সাথে দেশটার বিরোধী দলকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সন্ত্রাসীরা এই আন্দোলনে বিদেশি শক্তির প্রভাব, তার মানে বিরোধী দলটার ক্ষমতা খর্ব করা যায়নি সেটাও কি কোথাও স্বীকার করা হচ্ছে সে বিষয়টা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, সে রকম একইভাবে বিরোধী দল যদি সাধারণ মানুষের এজেন্ডাটাকে ধরতে না পারে, সেটাকে কাজে লাগাতে না পারে, তাহলে তারাও জনগণের সমর্থন কোনদিনও পাবে না। এটা তারাও বুঝলো এই কোটা বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ২০১৮ সালে যখন কোটা বাতিল করা হলো সেই সিদ্ধান্তকে অনেক আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত বলেছেন। সংস্কার না করে পুরোটাই বাতিল আবেগের বসে করা হয়েছিল বলে তাদের অনেকের মনে করেন। আজ প্রাপ্যজয়ের পর সেই কথা বার বার বলে আসছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন কোটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ নীতির অংশ, আর মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে যদি পুরস্কার করার নীতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সেটা কত প্রজন্ম পেতে পারে সেটাই বড় প্রশ্ন। মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমানে কুড়ি হাজার

টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বীরাঙ্গনাদের আশ্রয়ের প্রকল্প ঘর দেওয়া, মারা গেলে রাষ্ট্রীয়ভাবে গার্ড অব অনার দেওয়া, এ সমস্ত ব্যবস্থা সরকারিভাবে চালু আছে। স্বাধীনতার পর পর মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা নিয়োগের যৌক্তিকতা ছিল, তবে এখন প্রশ্ন থাকে যে এই স্থায়িত্ব দেওয়ার নৈতিক দিকটা কতটা ঠিক? মানে এই যে ৫% দেওয়া হয়েছে সেটাও কতটা ঠিক? কেন এতগুলো কথা বলতে হলো সেটাই এবার একটু বুঝিয়ে বলি। শুরুটা করি এভাবে তোমরা যদি জমিতে জুলুম লেখো, আসমানে ইনকিলাব লেখা হবে, মনে রাখা হবে সবকিছু। কোটা আন্দোলন কি শেখালো, শাসকের গদি অলংকার করে থাকলেও মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র ইজ গণতন্ত্র। মেনে নিন মানিয়ে নিন নীতি সবসময় খাটে না। যুবসমাজ ফুঁসে উঠলে শক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও লাভ হবে না। আর সেটা যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিভিন্ন মহলে যা আলোচনা হল তাতে করে স্পষ্ট এটাই যে, অদূরদর্শী অবস্থান আজকের এই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কারণ ছাত্র হত্যার দায় কার? এত বড় ঘটনার দায় কার? অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের দায় কার? ছাত্রলীগ নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা বাহিনী ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু আন্দোলনরত ছাত্রদের কাছে জবাবদিহিতা করা হয়নি কেন? করা হলো না কেন? আলোচনার আগে করা যাইনি কিন্তু পরে হলেও সুষ্ঠু একটা আলোচনা কোটার সমস্যার সমাধান করতে পারত। যখন ছাত্ররা ফুঁসছে চেয়ে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে তখন একটা আলোচনা কথা বলা হচ্ছে কেন? কারা নিয়ে গেছে সেল, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, ওদের ক্ষত ও বিক্ষত করেছে ততক্ষণে প্রাণ চলে গেছে বহু উঠতি বয়সের ছাত্রের। এ দায় কে নেবে? বুদ্ধিজীবী মহল সেই প্রশ্ন তুলছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনার দায় কার? বিভিন্ন দেশে আলোচনা শুরু হয়েছে, একেই কি বলে বিলম্বিত বোধদয়? আইনমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী আইনি প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া দ্রুত মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তখন অনেকগুলো প্রাণ ঝরে গেছে বহু মানুষ আহত আর দেশের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। কারফিউ দিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। কারফিউ এমন একটা সময় জারি করা হলো যখন পুলিশ র‍্যাব বিজিপির সাথে বিক্ষোভকারীদের ভয়ানক লড়াই হয়েছে। নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এই নিয়ন্ত্রণের আনতে ব্যর্থ হয়নি তো? আইনমন্ত্রী অবশ্যই বলেছেন আজকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থ হয়নি।

আপনি আপনার উত্তরটা জানতে পারেন? কোটা বাতিল নিয়ে মামলা হওয়ার বিষয়টা আদালতে সিদ্ধান্তের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল ছিল কি? বহু বিশেষজ্ঞ বলেছেন নির্বাহী উদ্যোগে মাধ্যমে শুরুতে এই নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। সংবিধান অনুযায়ী কোটা রাখা বা না রাখা এবং রাখলে কত ভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে তারা রাখবে সেটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। সরকারি চাকরি

কর্মসূচিতেও নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা প্রশংসার দাবি রাখে

সাধারণত আমাদের দেশে যেকোনো আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে প্রথমে নেতৃত্ব নির্বাচন করে কাউকে কনভেনার, যুগ্ম কনভেনার, সদস্য সচিব ও সদস্য করে একটা কমিটি গঠন করা হয়। এটা অতীতের ধারাবাহিকতা। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা সংস্কার আন্দোলনে কোন কনভেনার জয়েন্ট কনভেনার সদস্য সচিব না করে সমন্বয়ক পদ করা হয়। ১০ বা ২০ জন নয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য সমন্বয়ক নির্বাচন করা হয়। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়দের গ্রেফতার নিখোঁজ বা তুলে নেওয়ার ঘটনায় সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে স্লোগান উঠে তুমি কে, আমি কে? সমন্বয়ক, সমন্বয়ক। অর্থাৎ এক দুই বা দশজনকে গ্রেফতার করা হলেও এ আন্দোলন নেতা শূন্য হবে না। হয়ও নি। এ এক অভূতপূর্ব অন্যান্য নজির সৃষ্টি হয়েছে কোটা সংস্কার আন্দোলনে।

দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের ডাক অর্থাৎ কর্মসূচির নামকরণেও রয়েছে নতুনত্ব ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তির চমৎকার বৈশিষ্ট্য। যেমন কমপ্লিট শাটডাউন, মার্চ ফর জাস্টিস, রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ, প্রার্থনা ও ছাত্র জনতার গণ মিছিল, মুখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ, লং মার্চ টু ঢাকা। সর্বশেষ অসহযোগ।

বর্তমান কোটা পদ্ধতিতে সংস্কার প্রয়োজন তা মোটামুটি সমাজের সব মহলে মনে করেছিল।

প্রথম আলোতে এরকম একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। দেখে নিন রিপোর্টটি ২০১৮ সালে কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগকে মাঠে নামানো হয়েছিল। আবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তবে কি ছাত্রলীগকে প্রতিপক্ষ ভাবা হলেও সত্যি সত্যি। সেই প্রশ্ন না উঠে পারে না, সরকার অবশ্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এনেছিল। তারপরও সমগ্র আন্দোলনকারীরা যৌক্তিক সমাধান আশা করছিল। মেধা না কোটা সেই প্রশ্ন রেখেছিলাম তাতে কি কোন ভুল হয়েছিল? যে এত বড় ঘটনা ঘটলো বাংলাদেশে, প্রতিবাদী দেশের জন্যই, প্রতিবাদ দেশের পরিচয়, একবার ভাবুন তো ধৈর্যের বাঁধ কতটা ভেঙেছিল যে পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ছাত্ররা। পুলিশের তাক করা অস্ত্রের বিপরীতে সাঈদ বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। রাবার বুলেটে উড়ে এসে বুকে লেগেছিল সাঈদের। পুলিশ কেন সাঈদের বুক লক্ষ্য করে তা পর পর বুকে গুলি করল? বিকল্প কোনো উপায় ছিল কিনা সেগুলো আজ সব প্রশ্ন চিহ্ন, যদিও জানা যায় পুলিশ শুরুতে আবু সাঈদকে অন্যদিকে চলে যেতে অনুরোধ করে কিন্তু বুলেট কেন? অধিকার কর্মীরা বলেছেন, মানবাধিকার লংঘন করেছে পুলিশ, দাবি আদায় করতে গেলে, নিজের মত প্রকাশ করতে গেলে, যদি গুলি বিদ্ধ হতে হয় তাহলে তার থেকে খারাপ আর কিছু হয় না, এমনটাই মত বহু বিশেষজ্ঞের।

ওই যে প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম গণতন্ত্র ইজ গণতন্ত্র, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে কতটা স্বচ্ছ গণতন্ত্র। ঘটনাস্থল থেকে আবু সাঈদকে সরানো যেত নাকি কোনভাবে। প্রশ্নটা তীব্র উত্তর আশা করি আপনি দেখতে পাবেন যদি পান তাহলে জানাবেন প্লিজ।

কোটা না মেধা?

কোটা না মেধা এই বিতর্ক শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা দুনিয়ার কমবেশি সব দেশেই আছে। এ বিতর্কের মাঝেই অনেক দেশ কোটা বা সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু আছে। তবে তা সমাজের পিছিয়ে পড়া পিছিয়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষের জন্য। তাই আমাদের সংবিধানে সমতার উল্লেখ থাকলেও পিছিয়ে পড়া আদিবাসী প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করা হলেও এ নিয়ে কোনদিন কোন প্রশ্ন ওঠেনি। প্রশ্ন উঠেছে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ নিয়ে। কার্যত এই প্রশ্ন উঠেছে মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় প্রজন্মের সংরক্ষণ চালু করার পর। এই সংরক্ষণের বলা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও ৩০% সংরক্ষণ সুবিধা পাবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে স্বাধীনতার এত বছর পরও কি মুক্তিযোদ্ধারা অনগ্রসর। বলা হচ্ছে এটা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কিন্তু প্রশ্ন হলো মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে না খেয়ে অভুক্ত অবস্থায় মারা গেছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই তালিকাভুক্তি হতে পারেনি। সেক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানের প্রশ্ন কেন নয়। মনে রাখতে হবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ গ্রামের গরিব মানুষ। অশিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানহীন। মুক্তিযুদ্ধের পর তারা যে যার জীবিকায় ফেরত গেছে। অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করেছে। এখন সরকার বিশ হাজার টাকা ভাতা দিচ্ছে। কিন্তু এটা বেশিদিনের কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে আমি জাহিদ রহমানের ‘কামান্নার ২৭ শহীদ’ নামের একটি গবেষণা গ্রন্থের উল্লেখ করতে চাই। ওই গ্রন্থে বলা আছে, মাগুরার কামান্না গ্রামে এক রাতের এক সম্মুখ যুদ্ধে ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। আহত হন আরো অনেকে। ওই যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে মাত্র দুজন ছিল ছাত্র। মাগুরা কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সদস্য। ১১ জন ছিল বাওনীর শ্রমিক। আবুল বাশারের নেতৃত্বে দিন জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য। আর আর বাদ বাকিরা ছিল স্থানীয় গ্রামের কৃষক ও ক্ষেত মজুরের সন্তান।

গবেষক জাহিদুর রহমান মাগুরায় ভায়েনার মোড়ে এক নাম ফলকে ওই শহীদদের তালিকা দেখে বিস্মিত হয়ে জানতে উৎসাহী হন এবং তিনি তার

কামান্নার ২৭ শহীদ বইটি রচনা করেন। তিনি বইতে লিখেছেন ওদের কেউই মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় যুক্ত হয়নি। শুধু তাই নয়, ওই মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক বাবা-মা চরম দারিদ্রদের মধ্যে বসবাস করছে। এমনকি ওদের দু একজনের মা ভিক্ষা করে জীবন চালাচ্ছে। এইতো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা। এটা হয়েছে ঘটেছে কারণ ওরা শহরের শিক্ষিত এলিট নয়। এদের পরিবার জানেও না কি করে কি করতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকার কি করলো এই প্রশ্ন কেউ কোনদিন তোলেনি।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ভুয়া নাম আছে। অভিযোগ আছে এ সংখ্যা লক্ষাধিক। ধরে নিলাম এটা স্রেফ অভিযোগ। কিন্তু যাদের জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২, ৭৩ বা ৭৪ সালে তারা কি করে মুক্তিযোদ্ধা হয়। প্রথম আলোর এক রিপোর্টকে বলা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের ৫০ হাজারের বেশি সংখ্যক জন্ম মুক্তিযুদ্ধের পর। এই রিপোর্ট বেশ কয়েক বছর আগের। তার কি কোন তদন্ত হয়েছে? তার ফলাফল কি? তাই স্বাভাবিকভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই দেখা দিতেই পারে। দিয়েছেও।

এবার আসা যাক কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা চালু হলো। ১৯৭২ সালে ৫ সেপ্টেম্বর এক সরকারি আদেশ বলে এই কোটা পদ্ধতি চালু হয়।

এই কোটা নিয়ে দেশে দেশে বিতর্কের কথা বলছি। প্রতিবেশী ভারতে এ নিয়ে এখনো বিতর্ক হচ্ছে। আমার জানামতে পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সহ অন্যান্যদের মধ্যে সাত শতাংশ মুসলিম কোটা সংরক্ষিত। অন্ধ্রপ্রদেশে গত ১০ বছর ধরে ৫% মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা অন্ধ্র নয় ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই পিছিয়ে পড়াদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে। তবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে কোন সংরক্ষণ নেই। কারণ এ বিষয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর প্রবল আপত্তি ছিল। ১৯৬১ সালে ২৭ জুন একটি চিঠিতে নেহেরু বলেছিলেন, আমি কোনোভাবেই সংরক্ষণ পছন্দ করি না। বিশেষ করে চাকরিতে সংরক্ষণ। আমি এমন কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যা অদক্ষতাকে প্রচার করে। কোটার যদি উপযুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে আসে সে ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয় কারো। কিন্তু যদি মেধা থেকে কোটা বড় হয়ে যায় তখন তো সমস্যার সূত্রপাত হয়ই।

মনে রাখতে হবে যে যত মেধাবী সে তত বেশি টিকে থাকে। এটা শুধু ব্যক্তি নয় জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজকের দুনিয়ার আমরা দেখেছি যে জাতি যত মেধাবী সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই মেধার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প নেই শ্রম ও সততার।

শেষ কথা

১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি সৈনিকরা থাইল্যান্ড হয়ে বার্মা আসার পথে গভীর জঙ্গলে ভিতরে দ্রুত স্রোতস্বিনি কাওয়াই নদী তীরে এসে আটকে যায়। বাধ্য হয়ে জাপানি জেনারেল কাওয়াই নদীর উপর কাঠের সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। যে সেতুর উপর দিয়ে রেলপথে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে যাবে বার্মা সীমান্তে। কিন্তু ওই গভীর জঙ্গলে শ্রমিক পাবে কোথায়? তাই জাপানি জেনারেল শ্রমিকের বদলে ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীদের সেতু নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীরা বেঁকে বসে। তাদের সাফ কথা জেনেভা কনভেশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীরা শ্রম দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু জাপানি জেনারেল বলে কথা। ওরা জেনেভা কনভেশন সহ আন্তর্জাতিক রীতিনীতির থোড়াই কেয়ার করে। তারা যুদ্ধবন্দীদেরও নির্মাণ কাজে যুক্ত করতে জোর জুলুম শুরু করলো। এটা দেখে একপর্যায়ে যুদ্ধবন্দী এক ব্রিটিশ জেনারেল রাজি হলেন সেতু নির্মাণে। কিন্তু অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকরা সাফ বলে দিলেন ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ সেতু নির্মাণ করছে। আমরা আমাদের সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারি না। করবো না। এ কথা শুনে ব্রিটিশ জেনারেল খুব ধীরস্থির হয়ে শান্ত গলায় বললেন, এই যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। কিন্তু তারপরও এই রেল সেতু থাকবে। তখন এই রেল সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করবে অস্ত্রবাহী নয় যাত্রীবাহী ট্রেন। সাধারণ যাত্রীরা চলাচল করবে। চলাচল করবে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। তখন তারা এই সেতু নির্মাণের জন্য আমাদের কথা স্মরণ করবে। মনে মনে আমাদের ধন্যবাদ জানাবে। প্রার্থনা করবে। আর আমরা দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখে খুশি হব এই ভেবে যে আমাদের তৈরি সেতুতে জাপানের যুদ্ধাস্ত্র নয় সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ চলাচল করছে। এতে আমাদের ওই বন্দি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবো।

আমিও এই যুদ্ধবন্দি ব্রিটিশ জেনারেলের মতো বলতে চাই, এই আন্দোলনের আজ হোক কাল হোক সমাপ্তি ঘটবে। ঘটেছে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান। এখন এই শহরে এই দেশে বারুদের গন্ধ নয় আবারো অতীতের মতো ফুলের সুবাস ছড়াবে। মানুষ আবারও হাসি গানে মত্ত হবে। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে হৈ- হুল্লোড় করবে। মায়েরা নিশ্চিত মনে শিশুদের বাড়িতে আগমনের অপেক্ষায় থাকবে। অপেক্ষার প্রহর গুণবে সন্তানদের মুখে স্কুল-কলেজ আর খেলার মাঠে কৃতিত্বের অথবা অন্য কোন গৌরব গাঁথা শোনার জন্য। সেই শান্তিময় দিন খুব দূরে নয়। খুব শিগগ্রিই আসবে সেই দিন। আসবেই সেই দিন।

সবশেষে আরও একটি কথা বলতে চাই, তাহলো- হে তরুণ তুমি ঘুমিও না। শেষ হয়নি তোমার কাজ। তুমি নতুন দিনের মুক্তি সেনা, যুদ্ধের সাজে সাজো। তুমি বাঁচাও তোমার দেশ। তুমি সাজাও তোমার দেশ। তুমি এ প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ করো না শেষ।